ধর্মচিন্তা

ইমাম আল গাজ্জালী (রহঃ)

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান মানিক

জ্ঞানের গভীরতায় এবং চিন্তার মৌলিকতায় বিশ্ব ইতিহাসে আল গাজ্জালীর নাম অবিস্মরণীয়। মুসলিম ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারার ইতিহাসে আল গাজ্জালী (রঃ) এক অনন্য স্থান দখল করিয়াছেন। তিনি 'হুজ্জাতুল ইসলাম', বিশ্বাসের শোভা (Ornament of Faith, Zain-al-din) এবং ধর্মের পুনরুজ্জীবনকারী (Muzaddid) হিসাবে খ্যাত। আল সুবকি তাঁহাকে মূল্যায়ন করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, যদি মোহাম্মদ (সঃ)-এর পর আর কোনো নবীর আবির্ভাব ঘটিত, তবে সম্ভবত আল গাজ্জালী (রঃ) হইতেন সেই ব্যক্তি (দ্র. আল সুবকি তাজ আলদীন) : তাবাকাত আল শাফিয়া আলকুবর, কায়রো, ১৩২৪/ ১৯০৬, ৬৬:৪, পৃ ১০১]। তিনি একদিকে নিজের মধ্যে তাঁহার কালের বৌদ্ধিক ও ধর্মীয় আন্দোলন অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন, অপরদিকে ইসলামে বিকশিত 'আত্মার' বিভিন্ন আধ্যাত্মিক স্তরের ভাবনা-চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন আইন বেত্তা, দার্শনিক, সংশয়বাদী, মরমীবাদী, ধর্মবিদ, ঐতিহ্যবাদী ও নীতিবিজ্ঞানী।

ধর্মবিদ হিসাবে নিঃসন্দেহে, ইসলামে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তাঁহার সৃজনমূলক এবং উৎসাহী ব্যক্তিত্বের সজীব সংশ্লেষণ (Synthesis)-এর মাধ্যমে তিনি মুসলিম ধর্মতত্ত্বকে নবরূপ দান করেন এবং ইহার মূল্য ও ভাবধারাকে পুনর্জাগরিত করিয়া তোলেন। ইসলামে মৌলিকতাবাদ (Fundementalism) এবং আধ্যাত্মিকরণের (Spiritualization) সমন্বয় তাঁহার গভীর চিন্তার পরিচয়। তাঁহার কাল হইতে এই ভাবধারা অব্যাহতভাবে গৃহীত হইয়া আসিতেছে (দ্র. আব্দুল হাকিম : মুসলিম দর্শন চেতনা ও প্রবাহ, বাংলা একাডেমী ১৯৯৮, পৃ ১৮৫]।

খোরাসানের অন্তর্গত তুস নগরে তাবারান নামক স্থানে ৪৫০ হিজরী/ ১০৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আবু হামিদ মোহাম্মদ ইবনে গাউস, আহমদ আল তুসি আল সাদিই জন্মগ্রহণ করেন। তবে তিনি আল-গাজ্জালী হিসেবেই বিশ্বময় সুপরিচিত। তাঁহার পিতা ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ দরবেশ। আল-সুবকির মতে, তিনি স্বীয় হস্তে যাহা অর্জন করিতেন তাহা ব্যতীত অন্যকিছু দিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন না। অধিকাংশ সময়েই তিনি সুফী পরিবেশ ও সাহচর্যে ব্যয় করিতেন। অল্প বয়সেই আল-গাজ্জালী (রঃ) তাঁহার মা-বাবাকে হারান। ধর্মপরায়ন একজন সুফী পিতৃবন্ধু কর্তৃক তাঁহার ভ্রাতাসহ তিনি প্রতিপালিত হন ও শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার নিজ শহরে শেখ আহমদ ইবনে মোহাম্মদ আল রাদখানি-আল তুসি এবং পরে জুরজানে ইমাম আবু নসর আল ইসমাইলীর অধীনে তিনি বালক বয়সেই ধর্মতত্ত্ব এবং আইন শাস্ত্রে পাঠ গ্রহণ করেন। [দ্র. আল সুবকি, প্রাগুক্ত, পৃ ১০২]।

জুরজান হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তুসে কিছুকাল অতিবাহিত করেন এবং সম্ভবত এই সময় তিনি ইউসুফ আল নাসাজের অধীনে সুফিবাদ পাঠ করেন এবং সুফি ভাবধারা অনুশীলনও করেন [দ্র. আব্দুল হাকিম, প্রাগুক্ত, পৃ ১৮৬]। বিশ বছর বয়সে তিনি নিশাপুরে নিযামিয়া একাডেমীতে গমন করেন। সেখানে তিনি তৎকালীন ইমাম আল হারমায়েন নামে পরিচিত বিশিষ্ট আশারীয় ধর্ম তত্ত্ববিদ আল জুবাইনীর (রঃ) অধীনে আসেন এবং তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করেন। তাঁহার কাছেই তিনি ধর্মতত্ত্ব, আইন বিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সুফিবাদ অধ্যয়ন করেন। নিশাপুরে অবস্থানকালীন তিনি সুফী আবু আল কাসেম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আলী আল ফারমাদি (রঃ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার নিকট তিনি সুফিবাদের তত্ত্ব এবং এর অনুশীলন পদ্ধতি শিক্ষা লাভ করেন।

গাজ্জালীর (রঃ) জীবনের এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল নিযামুল মুলকের সঙ্গে পরিচয়। নিযামুল মুলক তখন মালিকশাহের ৪৬৫/১০৭২-৪৮৫/১০৯২ সালযুক সার্বভৌমের মহান উযির। নিযামুল মুলক জ্ঞান ও শিল্পের প্রচুর পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন এবং দরবারে উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ ঘটাইতেন। তিনি প্রায়শই বিতর্ক ও আলোচনার জন্য সভা ডাকিতেন। এইসব ক্ষেত্রে আল গাজ্জালী (রঃ) তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং অচিরেই তাঁহার বিতর্ক কৌশল সবার নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠে। মুসলিম আইন, ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনে আল গাজ্জালীর (রঃ) গভীর জ্ঞান নিযামুল মুলককে আকর্ষণ করে। তিনি তাঁহাকে বাগদাদে (৪৮৪/১০৯১) নিযামিয়া একাডেমীর প্রধান হিসাবে নিয়োগ দেন। আল গাজ্জালীর (রঃ) বয়স তখন মাত্র ৩৪ বছর। মুসলিম বিশ্বে এই পদ তখন ছিল অত্যন্ত গৌরবের ও সম্মানের। তাঁহার পূর্ব পর্যন্ত এত অল্প বয়সে কেহ এইপদ অলংকৃত করিতে পারেন নাই। একাডেমীর অধ্যাপক হিসাবে আল গাজ্জালী (রঃ) চরম সফলতা অর্জন করেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট ভাষণ, জ্ঞানের ব্যাপকতা এবং স্বচ্ছ ব্যাখ্যা তৎকালের প্রধান পণ্ডিতবর্গসহ বহুশ্রেণীর লোকের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করে। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তাঁহার বাগ্মিতা, পাণ্ডিত্য এবং দ্বান্দ্বিক কৌশল প্রশংসিত হয়। তাঁহাকে আশারীয় ঐতিহ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মবিদ হিসাবে গণ্য করা হয়। জাগতিক সফলতার দ্বারা একজন জ্ঞানী যাহা অর্জন করিয়া থাকেন, তিনি আপাতদৃষ্টিতে তাহাই লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্তর বা আভ্যন্তরীণ দিক হইতে তিনি বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক চরম সংকটের কাল অতিবাহিত করিতে থাকেন। প্রায় ৬ মাস যাবৎ তিনি তীব্র নৈতিক সংকট ও আধ্যাত্মিক যন্ত্রণার মধ্যে অবস্থান করেন। শারীরিক ও মানসিক দিকে তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন। তাঁহার ক্ষুধা ও হজম শক্তি হ্রাস পায় এবং কথা বলার শক্তি হারাইয়া ফেলেন। এই ঘটনা তাঁহাকে অধ্যাপক পদ হইতে ইস্তফা দিতে বাধ্য করে। সম্ভবত হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে তিনি বাগদাদ ত্যাগ করেন। কিন্তু বাস্তবে মনের নিশ্চয়তা এবং আত্মার শান্তির জন্য তিনি সুফির ধর্মীয় নীতি এবং নির্জন সাধনার তন্ময়তা অনুশীলনের জন্য সংকল্প নেন। পরিবারের জন্যে কিছু অর্থ ব্যতীত তিনি সমস্ত সম্পদ বর্জন করেন এবং সিরিয়ার অভিমুখে অগ্রসর হন। ৪৮৮/১০৯৫ হইতে ৪৯০/১০৯৭-এই দুইবছর দামেশকের উমাইয়াদের মসজিদ মিনারে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত অবসর জীবন যাপন করেন। এই সময় তিনি কঠোর সাধনায় নিমগ্ন থাকেন এবং ধর্মীয় রীতিনীতি অনুশীলন করেন। উমর (রাঃ) এর মসজিদে ধ্যান করার নিয়তে তিনি আরেকবার জেরুজালেম গমন করেন। হেবরনে ইব্রাহিমের (আঃ) মিনার পরিদর্শনের পর তিনি মক্কা ও মদিনায় হজ্বব্রত-র উদ্দেশ্যে গমন করেন। তাহার পর বিভিন্ন পবিত্র স্থান, মসজিদ, মাজার ও মরুভূমিতে নীরবে নিভৃতে সফর করেন। ১১ বছর পর তাঁহার দরবেশি ও পাণ্ডিত্যের জীবনে পরিসমাপ্তি ঘটে এবং পরিশেষে তিনি তাঁহার নিজশহর তুস-এ ৪৯৯/১১০৫-এ প্রত্যাবর্তন করেন।

তুসে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পুনরায় নিজেকে অবসর ও ধ্যানমগ্ন অবস্থায় নিয়োজিত রাখেন। কিন্তু অতিশীঘ্রই তাঁহাকে নিশাপুরে মায়মুণই নিযামিয়া কলেজে ধর্মতত্ত্বের পদ অলংকৃত করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বে তিনি তাহা গ্রহণ করেন, কিন্তু সেখানেও তিনি বেশীদিন অবস্থান করেন নাই। পুনরায় তিনি তাঁহার নিজবাড়ী তুসে অবসর জীবন কাটান এবং সেখানে তিনি একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ধর্মতত্ত্ব ও তাসাউফ শিক্ষা দান করিতে থাকেন। বাগদাদের পণ্ডিতবর্গ ও সাধারণ লোকের অনুরোধে প্রধান উযির আল মাইদ বাগদাদে পুরাতন নিযামিয়া একাডেমিতে শিক্ষাদানের জন্য তাঁহাকে আহ্বান জানান। কিন্তু আল গাজ্জালী (রঃ) তুসে থাকিবার সিদ্ধান্ত নেন। তুসে তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত শিষ্যদের সাহচর্যে শান্তিতে বসবাস করেন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন। ১৪ই জুমাদা ৫০৫/১৯শে ডিসেম্বর ১১১১-এ পরলোকগমন-এর পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রতিটি মুহূর্তকে পাঠে ও ধ্যানে ব্যয় করেন। আল গাজ্জালীর (রঃ) ছিল একটি সুন্দর সফল পরিপূর্ণ জীবন।

দর্শন : ইমাম গাজ্জালীর (রঃ) দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৌলিকতার দ্বারা চিহ্নিত। 'এই মৌলিকতা যতনা গঠনমূলক, তাহার চাইতে অধিকতর সমালোচনামূলক'। মনের অসাধারণ স্বাতন্ত্র্য শক্তির দ্বারা তিনি অ্যারিস্টোটলের অনুসরণীয় দার্শনিকবৃন্দের এবং তাঁহাদের মুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দ আল ফারাবি (রঃ) ও ইবনে সিনার (রঃ) বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কতিপয় দার্শনিক আক্রমণ, এবং ধর্মীয় আচারাদিকে দার্শনিক বুদ্ধির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া তাঁহাদের ঘোষণা—এই সবের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিবার মূল উদ্দেশ্যেই তিনি রচনা করেন 'তাহাফতুল ফালাসিফ' (দার্শনিকদের অসঙ্গতি)। ইমাম আল গাজ্জালী (রঃ) দার্শনিক মতবাদের বিশটি সমস্যা ধর্মের বিরোধপূর্ণ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। নিম্নে এইগুলো সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হইল :

১. জগৎ নিত্যতা দার্শনিক মতবাদের বিশ্বাসের প্রত্যাখ্যান। ২. জগৎ প্রকৃতির চিরঞ্জীবতায় (everlasting) দার্শনিকদের বিশ্বাসের খণ্ডন। ৩. আল্লাহ জগতের সৃষ্টিকর্তা এবং জগৎ তাঁহার উৎপন্ন দার্শনিকদের এই উক্তির প্রতিবাদ। ৪. সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব প্রমাণে দার্শনিকদের ব্যর্থতা। ৫. বৌদ্ধিক যুক্তির দ্বারা দ্বি-ঈশ্বরের অসম্ভাব্যতা প্রমাণে দার্শনিকদের অক্ষমতা। ৬. ঐশী গুণাবলী অস্বীকারে দার্শনিক মতবাদের খণ্ডন। ৭. আদিসত্তা (Principle) জাতি বা বিভেদক লক্ষণে (Differentia) বিভাজ্য নয় এই মতবাদ খণ্ডন। ৮. আদিসত্তা (Principle) অযৌগিক নির্গুণ (Unqualified) সত্তা দার্শনিকদের এই মতবাদ খণ্ডন। ৯. আদিসত্তা (Principle) শরীরী নয় প্রদর্শনে দার্শনিকদের অক্ষমতা। ১০. জগৎ নিত্যতা স্বীকারে এবং স্রষ্টার অস্বীকারে দার্শনিকদের বাধ্যবাধকতা বিষয় প্রসঙ্গে। ১১. আদিসত্তা (Principle) নিজেকে ব্যতীত অন্যকে জানেন- দার্শনিকদের এই মতপোষণ প্রমাণে ব্যর্থতা। ১২. স্রষ্টা নিজেকেও জানেন এই মত পোষণে দার্শনিকদের ব্যর্থতা। ১৩. আদিসত্তা (Principle) বিশেষকে (Particulars) জানেন এই মতবাদের খণ্ডন। ১৪. স্বর্গ একটি সজীব সত্তা যার গতি বা সঞ্চালন ঐচ্ছিক (Voluntary)- দার্শনিকদের এই মতবাদের খণ্ডন। ১৫. স্বর্গের গতি উদ্দেশ্য সম্পর্কীয় দার্শনিক মতবাদের প্রত্যাখ্যান। ১৬. স্বর্গের আত্মাসমূহ সব বিশেষকে জানে (Know all particulars) দার্শনিকদের এই মতবাদের খণ্ডন। ১৭. ঘটনার স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক (Natural) গতি পরিত্যাগের অসম্ভাব্যতা বিষয়ে দার্শনিক মতবাদের খণ্ডন। ১৮. মানবাত্মা বস্তু (Substance) যাহা নিজের মধ্যে অস্তিত্বশীল এবং ইহা দেহ কিংবা অবান্তর লক্ষণও নয়। ১৯. মানবাত্মাসমূহের বিনাশের অসম্ভাব্যতা বিশ্বাসে দার্শনিক মতবাদের খণ্ডন। ২০. দৈহিক পুনরুত্থানে দার্শনিকদের অস্বীকৃতির মতবাদের প্রত্যাখ্যান-যাহা প্রাকৃতিক কারণ দ্বারা উৎপাদিত হইয়া স্বর্গ-নরকে, সুখ-দুঃখ আকারে অনুভূত হইবে। [দ্র. আব্দুল হালিম, প্রাগুক্ত, ঐ পৃ ২১৪]।

ইমাম গাজ্জালী, উপরোক্ত বিশটি বিষয়ের মধ্যে তিনটিতে দার্শনিকদের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ আনেন: (১) জগতের নিত্যতা (২) বিশেষ সম্বন্ধে আল্লাহর জ্ঞানের অস্বীকৃতি (৩) দৈহিক পুনরুত্থান-এর অস্বীকৃতি। তাঁহার মতে, বাকী ১৭টি বিষয়ে দার্শনিকদের মতামত প্রচলিত ধর্মমতবিরোধী হইলেও অপেক্ষাকৃত কম আপত্তিকর। এইগুলি কেবল দার্শনিকরাই প্রচার করেন নাই, মুতাযিলা প্রমুখ আরো কোন কোন মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ও প্রচার করিয়াছেন। ইহার জন্য তাহাদের স্বধর্মত্যাগী বলা অনুচিত।

সুফিবাদ : ইসলামের তিনজন শ্রেষ্ঠ সুফীর মধ্যে ইমাম গাজ্জালী [illegible] অপর দুইজন হইতেন সুফী ইবনুল আরাবী (রঃ) ও মাওলানা জালালউদ্দিন রুমি (রঃ)। যে সকল সুফী সাধক ইসলামের সাথে সুফী মতের সামঞ্জস্য সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ইমাম আল গাজ্জালীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানরা সুফীদের খাঁটি মুসলমান বলিয়া স্বীকার করিতেন না। কারণ, আল্লাহর ধ্যানে তন্ময় অবস্থায় অনেক সময় তাঁহারা শরীয়ত বিরোধী অনেক কথা প্রকাশ করিতেন। ইমাম গাজ্জালী বলেন যে, শরীয়ত বিধানের উপর নিষ্ঠাবান থাকিয়া সুফীদের মারেফাত সাধন করিতে হয়। তিনি সুফীদের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দান করিয়া শরীয়ত ও মারেফাত অর্থাৎ শাস্ত্রপন্থী মুসলমান ও সুফীদের মধ্যকার বিরোধ দূর করিয়া ইসলামী সাধনার পূর্ণতা দান করেন। সুফী মতবাদ যে ইসলাম ধর্মসম্মত মতবাদ তিনি তাহা প্রমাণ করেন [দ্র. মোঃ সোলায়মান আলী সরকার: ইবনুল আরাবী ও জালাল উদ্দিন রুমী, বাংলা একাডেমী ১৯৮৪, পৃ ১৩]।

ইমাম গাজ্জালীর (রঃ) মতে, মরমী অভিজ্ঞতা এমন একটি সজীব প্রাণবন্ত জিনিস যাহা ধর্মীয় জীবনকে করিয়া তোলে সমৃদ্ধ ও অর্থবহ। মুসলিম দার্শনিক ও কালামিকা ধর্মবেত্তা, উভয় সম্প্রদায়কেই তিনি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, আল্লাহর প্রত্যক্ষ সজীব অভিজ্ঞতাই ধর্মীয় নিশ্চিতির ভিত্তি। এই সজীব ধর্মীয় অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি সচল ও শক্তিশালী করিয়ে তুলিয়াছেন মুসলিম আইন ও নৈতিকতাকে [দ্র. আমিনুল ইসলাম : মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, বাংলা একাডেমী ১৯৯৫, পৃ ২২৫]। তাঁহার এই অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট [illegible] ইহইয়াউ উলুম আল-দীন (ধর্ম বিজ্ঞানের পুনর্জীবন) নামক তাঁহার প্রধান গ্রন্থে। কিন্তু আল গাজ্জালীর (রঃ) রহস্যমূলক শিক্ষা সকল শ্রেণীর লোকের পড়ের উদ্দেশ্যে রচিত। তবে এই গ্রন্থটি অধ্যয়ন করিতে হইলে তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ যেখানে তাঁহার সুফী মতবাদ বিশেষ আলোচিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করা উচিত। এইগুলি হইতেছে, 'মিশকাত আল আনওয়ার', 'আল রাসায়িল আল আকালিয়া' এবং 'মুকাশাকাত আল কুলুব' এবং অনুরূপ অন্যান্য গ্রন্থ। এইসব গ্রন্থে যে মতবাদ পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাকে দিব্য জ্ঞানমূলক মরমিবাদ (Theosophical mysticism) বলিয়া [illegible] করা যায়।

উপসংহার : ভুবন বিখ্যাত ইমাম আল গাজ্জালীর (রঃ) দার্শনিক ইতিহাসে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় [illegible] অপরিসীম প্রভাব গভীর ও ব্যাপক [illegible] পশ্চিম আফ্রিকা হইতে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বহু মুসলিম লেখকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। কালের আবর্তে এইসব লেখা আজ প্রায় বিলুপ্ত। কিন্তু ইমাম গাজ্জালীর (রঃ) রচনাবলী মুসলিম সমাজে আজো সাদরে পাঠ করা হইতেছে। ধর্মবিদ হিসাবে তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার প্রণীত বিধিমালা, সমাজ জীবন তথা সমগ্র জীবনের জন্য রচিত তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তক ইহইয়া উলুম প্রায় মুসলিম গৃহে শোভা পাইতেছে। যুক্তিসঙ্গত কারণেই উল্লেখ করা হয়, "মুসলিম সমাজে এককভাবে আল গাজ্জালীর (রঃ) প্রভাব সম্ভবত অন্য যে কোন মুসলিম ধর্মবিদের হইতে অনেক বেশী।" □

দৈনিক ইত্তেফাক/১১ ফেব্রুয়ারী ২০০০/পৃ ৫